ক্যাম্পাসের পরিবেশ নষ্টে বুলিং

রাবেয়া ঝুমুর

প্রকাশিত: ২০:০৮, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫

বুলিংয়ের শিকার হয়ে মাস্টার্স না করেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়েন তরুণী। কী ঘটেছিল তার সঙ্গে? গত ১৬ সেপ্টেম্বর একটি দৈনিকের এই প্রতিবেদন অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ বরেছে। বিশেষত ভুক্তভোগীর এই বক্তব্যটি- 'যৌন হয়রানি নিয়ে অনেকে কথা বলেন। কিন্তু বুলিং-গসিপের মতো মানসিক হয়রানির ভয়াবহতা ততটা গুরুত্ব পায় না।' তরুণী আরও জানান, 'এটা (বুলিং) সেখানে শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয়। অথচ হেনস্তাকারীর কারণে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স করতে পারলাম না।' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সাবেক শিক্ষার্থী তার ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেছেন, যেখানে সহপাঠীদের দ্বারা বুলিং ও গসিপের শিকার হয়ে তিনি মানসিকভাবে এতটাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, তাকে একজন মনোবিদের কাছে ছয়-সাতটি কাউন্সেলিং সেশন নিতে হয়েছিল। এই ঘটনাগুলোর কারণে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে তার মাস্টার্স সম্পন্ন করতে পারেননি এবং শেষ পর্যন্ত বিদেশে চলে যেতে বাধ্য হন।

ক্যাম্পাসের স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্ন

অনেক স্বপ্ন নিয়ে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। ক্যাম্পাস তাদের জন্য জ্ঞান অর্জন ও ভবিষ্যৎ গড়ার এক পবিত্র স্থান। অথচ প্রায়ই এখানে কারো কারো স্বপ্ন পরিণত হয় দুঃস্বপ্নে। র‍্যাগিংকে সামাজিক ব্যাধি হিসেবে মূল্যায়ন করা হলেও বুলিংকে খুব মামুলি সমস্যা ধরা হয়। কেন বুলি করা হয়েছে-দোষ যেন ভুক্তভোগীর। মানসিক চাপে বৃন্তচ্যুত ফুলের পরিণতি কারোর চোখে

পড়ে না! বুলিং বা র‍্যাগিং হলো এক ধরনের ইচ্ছাকৃত, ক্ষতিকর এবং আক্রমণাত্মক আচরণ; যা শারীরিক বা মানসিক উভয় ক্ষেত্রেই হতে পারে। ব্যঙ্গ করে নাম ধরে ডাকা, অপমান করা, কুরুচিপূর্ণ অঙ্গভঙ্গি, শারীরিক আঘাত বা অনলাইনে হয়রানি- এসব কিছুই বুলিংয়ের অন্তর্ভুক্ত। এটি কেবল সাধারণ দুষ্টুমি নয়, বরং এক ধরনের সহিংসতা যা শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন, মানসিক স্বাস্থ্য এবং সামগ্রিক সাফল্যের ওপর দীর্ঘমেয়াদী নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। অনেকে শিক্ষার্থী পড়াশোনা ছেড়ে দিতেও বাধ্য হয়।

ক্যাম্পাস লাইফে প্রভাব

এ ধরনের অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ কমিয়ে দেয়, যা তাদের মেধার ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। মেডিকেল শিক্ষার্থীদের ওপর করা এক গবেষণায় দেখা গেছে, বুলিংয়ের কারণে তাদের মধ্যে বিষণ্নতা, উদ্বেগ এবং পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়ার মতো সমস্যা দেখা যায়। কিছু ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা হল ত্যাগ করতে বা এমনকি কলেজ ছেড়ে দিতেও বাধ্য হয়।

পরিসংখ্যান কী বলছে

বেসরকারি সংগঠন আঁচল ফাউন্ডেশনের এক জরিপ অনুযায়ী, দেশের ৮৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৮০ শতাংশ শিক্ষার্থী হতাশার মধ্য দিয়ে গিয়েছেন। বুলিংয়ের শিকার শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া, ক্লাসে যেতে ভয় পাওয়া, মানসিক দুর্বলতা এবং হীনম্মন্যতায় ভোগার মতো প্রবণতা দেখা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর ফলে আত্মহননের প্রবণতাও তৈরি হয়। একই সংগঠন ২০২২ সালের মার্চে ‘তরুণীদের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট এবং মানসিক স্বাস্থ্যে এর প্রভাব’ শিরোনামে আরেকটি জরিপ প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এতে বলা হয়, তরুণীরা তাদের দেহের আকৃতি, গঠন ও অবয়ব নিয়ে কথাবার্তায় হেয়প্রতিপন্ন বোধ করেন। বন্ধুবান্ধবের কাছে ‘বডি শেমিং’-এর শিকার হয়েছেন ২২ শতাংশ তরুণী। এই জরিপে এক হাজারের বেশি তরুণী অংশ নিয়েছিলেন।

ছাত্র রাজনীতি ও বুলিং

ক্যাম্পাসে বুলিংয়ের একটি অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে উঠে এসেছে ছাত্র রাজনীতি। অনেক সময় র‍্যাগিংয়ের নামে নবীন শিক্ষার্থীদের ওপর বর্বরোচিত শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হয়, যা প্রায়শই সাংগঠনিক রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকে। বুয়েটের আলোচিত আবরার ফাহাদ হত্যার ঘটনাটি এই ভয়াবহতারই এক জ্বলন্ত উদাহরণ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি জরিপে দেখা গেছে, ৮৪ শতাংশ শিক্ষার্থী ছাত্র রাজনীতির বিরুদ্ধে এবং ৯৬ শতাংশ মনে করে দলীয় ছাত্ররাজনীতি শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। শিক্ষার্থীরা প্রায়ই ক্যাম্পাসে ‘ক্ষমতার রাজনীতি’র শিকার হয় এবং তারা জুলুম ও হয়রানি থেকে মুক্তি পেতে একটি নিরাপদ ও রাজনীতিমুক্ত পরিবেশের প্রত্যাশা করে। আবরার ফাহাদের প্রাণের বিনিময়ে র‍্যাগিং বিষয়টি সম্মুখে আসলেও বুলিং এখনও ‘সাইলেন্ট কিলার’ হিসেবে থেকে গেছে। প্রমথ চৌধুরী যেমন বলেছিলেন, দেহের মৃত্যুর রেজিস্টারি রাখা হয়, আত্মার হয় না।

সরকারের পদক্ষেপ

এই সমস্যা মোকাবিলায় সরকার এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় বুলিং ও র‍্যাগিং প্রতিরোধে 'শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বুলিং ও র‍্যাগিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত নীতিমালা-২০২৩' জারি করেছে। এই নীতিমালা দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য।

নীতিমালায় যা আছে

হ প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৩ থেকে ৫ সদস্যের একটি বুলিং ও র‍্যাগিং প্রতিরোধ কমিটি (অইঈ) গঠন করতে হবে।

হ বুলিং বা র‍্যাগিং প্রমাণিত হলে প্রচলিত আইন, প্রয়োজনে ফৌজদারি আইনেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

হ সন্দেহজনক স্থানগুলোতে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করতে হবে।

হ সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করতে হবে।

হ প্রশিক্ষিত শিক্ষককে কাউন্সেলর হিসেবে নিয়োগ দিতে হবে।

বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ

তবে, এই নীতিমালা প্রণয়ন সত্ত্বেও তার বাস্তবায়ন নিয়ে চ্যালেঞ্জ থেকে যাচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর অভিযোগের ঘটনায় যেমনটি দেখা যায়, কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে অনেক সময় অপরাধীরা আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে । কার্যকর প্রয়োগের অভাবে নীতিমালা কেবল কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ থেকে যেতে পারে । ইউনিসেফের মতে, যদি কোনো শিক্ষার্থী বুলিংয়ের শিকার হন, তবে তার প্রথম পদক্ষেপ হওয়া উচিত বাবা-মা, পরিবারের কোনো ঘনিষ্ঠ সদস্য, বা অন্য কোনো বিশ্বস্ত প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির কাছে সাহায্য চাওয়া। এর মধ্যে স্কুলের কাউন্সেলর, খেলাধুলার প্রশিক্ষক বা পছন্দের শিক্ষকও অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। অনলাইন বুলিংয়ের ক্ষেত্রে বুলির মেসেজ উপেক্ষা করা বা অ্যাকাউন্টকে রেস্ট্রিক্ট টুলের মাধ্যমে সুরক্ষিত রাখার কথাও বলা হয়েছে । তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, সমস্যার কথা গোপন না রেখে সাহস করে অভিযোগ করা, কারণ কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করলে অপরাধীরা আরও বেপরোয়া হতে পারে না।

মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের হলে ও ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের (টিএসসি) তিনতলায় বিনা মূল্যে মানসিক সহায়তা দেওয়া হয়। প্রচারণার অভাবে এই সহায়তার কথা অনেকেই জানেন না। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা কেন্দ্র থাকতে হবে এবং সব শিক্ষার্থী সেবা নিয়ে ওয়াকিবহাল তা নিশ্চিত করতে হবে। আজকে যারা বুলি করছে আগামীতে তারাই কর্মস্থলে অন্য কারোর মানসিক বিষাদের কারণ হবে। সহকর্মী দ্বারা বুলিং, গসিপ, ব্যক্তিগত আক্রমণ কৌশলে এড়িয়ে গেলেও মানসিক স্বাস্থ্যে এর প্রভাব ব্যাপক। বুলিং বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ দিবস পালন করা যেতে পারে। এটি শুধু কাউকে মৌখিকভাবে আঘাতই করে না, অনেক স্বপ্নের মৃত্যু ও ঘটায়। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বুলিং এখন একটি গভীর সংকট। এটি কেবল ব্যক্তিগত হয়রানি নয়, বরং শিক্ষাব্যবস্থার একটি বড় ব্যর্থতা যা শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎকে হুমকির মুখে ফেলছে। কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ন নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ, কিন্তু এর সফল বাস্তবায়ন নির্ভর করে একটি নিরপেক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং সমাজের সকল স্তরে সচেতনতা

বৃদ্ধির ওপর। বুলিংমুক্ত ক্যাম্পাস গড়ার জন্য শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক এবং প্রশাসন- সবারই সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। তবেই শিক্ষার সুস্থ পরিবেশ ফিরে আসবে এবং আমাদের তরুণ প্রজন্ম একটি নিরাপদ ও সম্মানজনক পরিবেশে বিকশিত হতে পারবে।